সাম্যবাদ বুলেটিন

'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা | মার্চ ২০২৫ | মূল্য ২ টাকা

ঐকমত্য কমিশনের সভায় 'বাসদ (মার্কসবাদী)'-এর বক্তব্য

(অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর মধ্যে ৬টি সংস্কার কমিশন তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করেছে। এই সংস্কার প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা ও জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ঐকমত্য কমিশনের প্রথম সভায় 'বাসদ (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষ থেকে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা ও সদস্য কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বৈঠক আহ্বান করা হয় এবং বৈঠকটি ছিল মূলতঃ প্রারম্ভিক ও পারস্পরিক পরিচিতির উদ্দেশ্যে। ইতোমধ্যেই আমরা ৬টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চারটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া প্রস্তুত করেছিলাম। ফলে প্রথম বৈঠকেই আমরা সেটা তাদের কাছে পেশ করেছি। পরবর্তীতে অন্যান্য কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে ও এই চারটিরও খুঁটিনাটি নিয়ে আমাদের বিস্তারিত বক্তব্য আমরা তুলে ধরব। প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রেরিত বক্তব্য সামান্য সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হলো।)

গত ১২ জানুয়ারি এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন গঠিত হয়। ইতোমধ্যে ৬টি কমিশন (সংবিধান, নির্বাচন, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন, পুলিশ ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন) তাদের রিপোর্ট সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের প্রথম সভায় আমরা এই ছয়টি কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

প্রথমেই আমরা বলতে চাই যে, প্রথম সভায় আমরা এই ছয়টি রিপোর্ট নিয়ে আমাদের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বক্তব্য রাখছি না। এই রিপোর্টগুলিতে সামগ্রিকভাবে সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে, আমরা শুধু সে বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। ফলে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্যটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

এ ব্যাপারে সবাই হয়তো একমত হবেন যে, ছয়টি কমিশনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একে কেন্দ্র করে এবং এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাকি রিপোর্টগুলি তৈরি হয়েছে। তাই ধরে নেয়া যায় যে, সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে। আমরা ছয়টির মধ্যে চারটি কমিশনের রিপোর্টকে কেন্দ্র

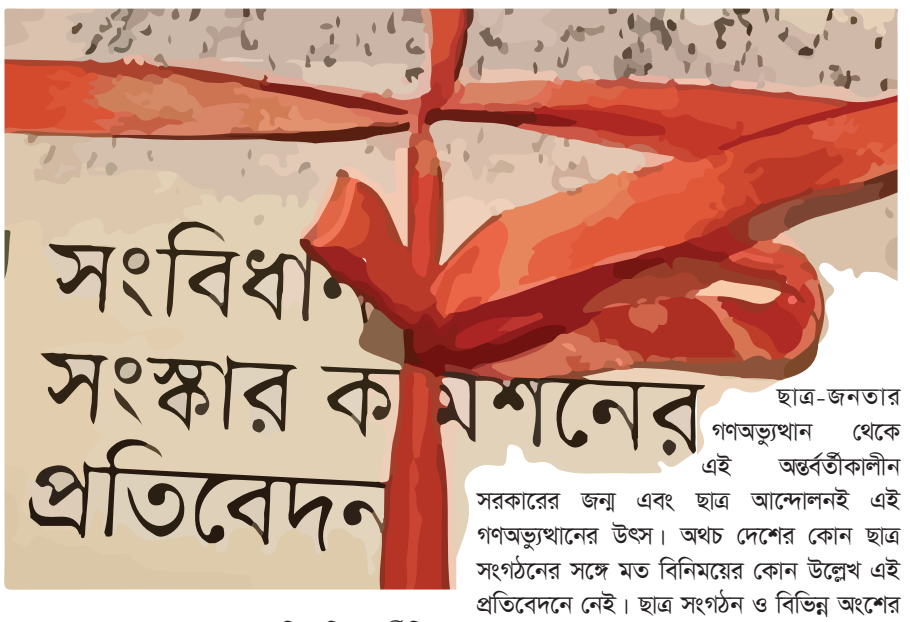

করে আমাদের বক্তব্য রাখব। বাকি দুটির (দুর্নীতি দমন ও জনপ্রশাসন) ব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত লেখায় আমরা উল্লেখ করব। এই চারটির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জোর পড়বে সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টের উপর।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রসঙ্গে

১. শুরুতেই উল্লেখ করা দরকার যে, এই রিপোর্টের মূল বিষয়গুলোর সাথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রস্তাবিত খসড়া জুলাই ঘোষণার সাদৃশ্য রয়েছে। গত ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টার আহবানে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে আমাদের দল জুলাই ঘোষণার ভুল, অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত পয়েন্টগুলো লিখিত আকারে তুলে ধরে এবং পাশাপাশি এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য উত্থাপন করে।

২. প্রতিবেদনের ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের একটা রূপরেখা বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে। এটা বিস্ময়কর যে, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান থেকে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্ম এবং ছাত্র আন্দোলনই এই গণঅভ্যুত্থানের উৎস। অথচ দেশের কোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মত বিনিময়ের কোন উল্লেখ এই প্রতিবেদনে নেই। ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন অংশের ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময় ছাড়া এই প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে সংস্কারের যে সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার প্রথম উদ্দেশ্য (পৃষ্ঠা ২) এবং কমিশনের সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপের প্রথম সুপারিশ (পৃষ্ঠা ৫)-এ তারা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারকে সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই পয়েন্টটি আবার পৃথকভাবে ২য় পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে 'জুলাই ঘোষণা' বক্তব্যে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেখানে আমরা বলেছি,"... অথচ ১০ এপ্রিলের এই ঘোষণাপত্রে শেখ মুজিবকে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রনয়ণের ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীসহ সকল মন্ত্রীদের নিয়োগ, গণপরিষদ আহবান ও মূলতবি করা, জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র শেখ মুজিবকে যে ক্ষমতা দিয়েছে, বাহাত্তরের সংবিধান এরচেয়ে বেশি কিছু করেনি।. . . স্বাধীনতার ঘোষণপত্রে উল্লেখিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার– এই তিনটি শব্দের উপর তারা যে জোর দিয়েছেন, তাও বাহাত্তরের সংবিধানে উল্লেখ করা আছে। এগুলোকে অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। কথাটা এইভাবে আছে যে, "... আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা– যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

এই প্রতিবেদনে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে ভিত্তি হিসেবে ধরলেও বাহাত্তরের সংবিধান সম্পর্কে কিছু ইতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ২) আমাদের মনে হয়েছে যে, সংস্কার কমিশন ১৯৭১ এর স্বাধীনতার ঘোষণা ও ১৯৭২ এ প্রণীত সংবিধানের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে বিভ্রান্তিকর অবস্থানে রয়েছেন। ফলে কেন তারা ১৯৭১ এর স্বাধীনতার ঘোষণাকে সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে ধরেছেন তারা তা স্পষ্ট করতে পারেননি।

৩. প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা পর্বে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটা

২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

কৃষিখাতে আমূল সংস্কারের দাবিতে
রংপুরে কৃষক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করা, সার-বীজ-কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণের দাম কমানো, ক্ষেতমজুরদের সারাবছরের কাজের নিশ্চয়তা, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, আর্মি-পুলিশের রেটে রেশনসহ কৃষিখাতের ১৯ দফা সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে গতকাল ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রবিবার, সকাল ১১টায় টাউনহল মাঠে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমরেড আহসানুল আরেফিন তিতুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক অজিত দাসের সঞ্চালনায় কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভাষাসৈনিক মোঃ আফজাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা ঋতু, বাসদ (মার্কসবাদী) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের রংপুর জেলার আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, গাইবান্ধা জেলার সভাপতি আহসানুল হাবীব সাঈদ, কিশোরগঞ্জ জেলার সংগঠক আলাল মিয়া, নীলফামারী জেলার নেতা রফিকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ জেলার সংগঠক আব্দুর রাজ্জাক, আলুচাষী সাইফুল ইসলাম, আখচাষী রবিউল ইসলামসহ সারা দেশ থেকে আগত কৃষক নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, *২য় পৃষ্ঠায় দেখুন*

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঐকমত্য কমিশন

ঐতিহাসিক রূপরেখা বিস্তারিতভাবে দেয়া আছে। (পৃষ্ঠা ১৩ - পৃষ্ঠা ৩১) এই বিষয়ে আমাদের কিছু পর্যবেক্ষণ পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করছি।

ক) অবিভক্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে এ প্রতিবেদন দাবি করছে, ১৯৪০ সালে প্রস্তাবিত 'লাহোর প্রস্তাব'। (পৃষ্ঠা ১৬) এই উপমহাদেশের বিরাট ভূ-খণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে কেবলমাত্র লাহোর প্রস্তাবকে উপস্থাপন করাটা আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক নয়।

খ) প্রতিবেদনে উল্লেখিত ইতিহাসে বিস্তারিতভাবে পাকিস্তান পর্বের বর্ণনা আছে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ হিসেবে গণ্য করে এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই ভূ-খণ্ডের উপর চূড়ান্ত শোষণ ও লুণ্ঠন চালায়– এই প্রতিষ্ঠিত বক্তব্যটি এই প্রতিবেদনে অদ্ভূতভাবে অনুপস্থিত।

গ) পূর্ব পাকিস্তান যে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল– এই বক্তব্যটি না আনার ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রতিবেদন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও তার শহিদদের, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের তাৎপর্যকে, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনকে– একেবারে উল্লেখ করেনি বললেই চলে। অথচ এই আন্দোলনগুলি বাংলাদেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের উপনিবেশবিরোধী চরিত্র, যা স্বাধীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল ও যার ফলশ্রুতিতে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল– এই ঐতিহাসিক ক্রমটি এভাবে বিবৃত করা হয়নি।

ঘ) আমরা জুলাই ঘোষণা নিয়ে বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলাম যে, মওলানা ভাসানী প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের ডাক দিয়েছিলেন। এই প্রতিবেদন তার স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ – এই দীর্ঘ ২০ বছরে একটার পর একটা গণআন্দোলনে ভাসানীর যে বিরাট অবদান, তা এ প্রতিবেদনে পাওয়া যায় না। এখানে আমরা আরও উল্লেখ করতে চাই যে– বাহাত্তরের সংবিধানের তিনটি মূলনীতি অর্থাৎ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কখনই শেখ মুজিবর রহমান কিংবা আওয়ামী লীগের সম্পত্তি ছিল না। মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে এই ভূ-খণ্ডের বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এই ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং সর্বোপরি ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল টাঙ্গাইলের সন্তোষে ভাসানীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক থেকে সংবিধানে এই ধারণাগুলি যুক্ত করার জোর দাবি জানানো হয়। কমিশনের রিপোর্টে বাহাত্তরের সংবিধান প্রসঙ্গে ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের বক্তব্যগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এই বক্তব্যটি উল্লেখ করা হয়নি। এটি প্রতিবেদনে আসা প্রয়োজনীয় ছিল বলে আমরা মনে করি।

৪. বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়নের পরপরই চারটি সংশোধনী এনে ১৯৭৫ এর মধ্যেই শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ তাদেরই প্রণীত সংবিধানকে বাস্তবে অকার্যকর করে দেন। জরুরী অবস্থা জারি করে, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের দ্বারা বাকশাল গঠন করেন এবং জনগণের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার নামিয়ে আনেন। এই অধ্যায়টি প্রতিবেদনে আরও পরিষ্কারভাবে আসা উচিত ছিল। ফলে ফ্যাসিবাদের বীজ বাহাত্তরের সংবিধানের মধ্যেই নিহিত ছিল– প্রতিবেদনের এই বক্তব্য সঠিক নয় বলে আমরা মনে করি। জুলাই ঘোষণা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্যে আমরা বলেছিলাম যে, "... ১৯৭২ সালের প্রণীত সংবিধানের উপর মোট ১৭টি সংশোধনী বিভিন্ন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এনেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংশোধনী ছাড়া এর প্রত্যেকটি সংশোধনী জনগণের অধিকার কোন না কোনভাবে খর্ব করেছে। আমাদের দলের অভিমত হলো, বাহাত্তরের সংবিধানের প্রগতিশীল ইতিবাচক দিকগুলোকে অক্ষত রেখে মূলতঃ কাঠামোগত দিকটা সংস্কার করা উচিত। একইসাথে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজ– এই ছয়টি মৌলিক অধিকারকে 'মৌলিক অধিকার' অধ্যায়ে সংযুক্ত করা উচিত এবং মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে রচিত অধিকারগুলোকে আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য করা উচিত। . . ."

৫. কমিশনের দাবি, এই প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার করলে দেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিহত হবে। আমরা এটিকে একটি সরলীকৃত ব্যাখ্যা মনে করে। আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে চাই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরপর্বে কী ছোট, কী বড়, কী উন্নত, কী অনুন্নত– সকল পুঁজিবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদ শিকড় গেড়েছে। ফ্যাসিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অর্থাৎ পুঁজির ক্রমাগত কেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকতা ও কঠোরতা এবং বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের সাথে আধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সাংস্কৃতিক যন্ত্রীকরণের চেষ্টা– এগুলিকে হাতিয়ার করে সকল পুঁজিবাদী দেশের শাসকশ্রেণি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ ধ্বংস করতে চেয়েছে। ফ্যাসিবাদকে হাতিয়ার না করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বারা জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান করা তার পক্ষে অসম্ভব। ফলে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ ঐক্যবদ্ধ জনগণের সচেতন, সংগ্রামী, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গণআন্দোলনের যে হাতিয়ারগুলি তৈরি হয়েছিল, পুঁজিবাদী শাসন যদি সেইগুলোকে বিকল করে দেয় এবং জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়, তবে বাংলাদেশে অন্য কোন শক্তির মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ কায়েম হবে। ইতিহাস এর স্বাক্ষী।

৬. কমিশনের সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপের ৭ নং পয়েন্টে সুপারিশ করা হয়েছে– মৌলিক অধিকারের আওতা সম্প্রসারণ, সাংবিধানিক সুরক্ষা ও বলবৎযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ। (পৃষ্ঠা ৫) অথচ তার দুই পৃষ্ঠা পরে (পৃষ্ঠা ৭) ঠিক উল্টো কাজটা করা হয়েছে। সেখানে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত আলোচনার ২ নং পয়েন্টে আমাদের দলের দীর্ঘদিনের দাবি খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানকে মৌলিক অধিকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার ৫ নং পয়েন্টে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করার সুপারিশ করা করা হয়েছে। অর্থাৎ বাহাত্তরের সংবিধানের মতোই এখানেও অত্যাবশকীয় মৌলিক অধিকারগুলোকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেয়া হয়নি ও আইন দ্বারা বলবৎ করা হয়নি।

৭. প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে সুপারিশের যৌক্তিকতা সম্পর্কিত অংশে রাষ্ট্রের মূলনীতি সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্তির আলোচনায় কমিশন প্রস্তাব করেছে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রকে মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে বাদ দিতে। যে ধারণাগুলিকে কমিশন বাদ দিল এবং যে ধারণাগুলিকে কমিশন অন্তর্ভুক্ত করলো– তার যুক্তিগুলো পরিষ্কার নয়।

ক) জুলাই ঘোষণা প্রসঙ্গে বক্তব্যে আমরা উল্লেখ করেছি, ". . .গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা একটা আধুনিক, গণতান্ত্রিক সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়ারা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী স্বাধীনতা, এক মানুষ-এক ভোট এসকল প্রগতিশীল ধারণাগুলো নিয়ে এসেছিল। এরপর থেকে সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রই তাদের সংবিধানকে এই ধারণাগুলোর উপর দাঁড় করায়।. . ."

খ) বাহাত্তরের সংবিধানে যেভাবে জাতীয়তাবাদের ধারণা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ ও আলোচনার দাবি রাখে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে সব জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি ও সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটির ধারণা ইউরোপীয় নবজাগরণ থেকে আসা। শব্দটি দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

গ) সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনাটা পড়লেই বোঝা যায়, কমিশন বোধহয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কে অস্পষ্ট। কমিশনের এ সম্পর্কিত আলোচনাটি খুবই একপেশে। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, দুনিয়ায় সোভিয়েত সমাজতন্ত্র

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রংপুরে কৃষক কনভেনশন

২০২৪ এর গণ-অভ্যুত্থানে হাজারো ছাত্র জনতার আত্মদান ও রক্তের বিনিময়ে আবারও বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি শোষণ-বৈষম্যের শিকার কৃষক ক্ষেতমজুরদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত না করে বৈষম্যহীন দেশ নির্মাণ সম্ভব নয়। অবিলম্বে অন্তর্বর্তী সরকারকে কৃষি সংশ্লিষ্ট সবার মতামতের ভিত্তিতে কৃষকের স্বার্থের পরিপূরক কৃষিখাত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কৃষিখাতে কৃষি উপকরণ ও ফসলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে কিছু দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ী ও কোম্পানির সিন্ডিকেট এবং মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরা। স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সরকার এ সকল পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থে কৃষি সংক্রান্ত নানা বিধিবিধান তৈরি করেছে। ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-ক্ষেতমজুর-ভূমিহীন গরীব মানুষ সবসময় শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছে। কৃষক ক্ষেতমজুরদের অধিকার আদায়ে ইস্পাতদৃঢ় সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

কনভেনশনের শেষে নিম্নোক্ত দাবির ভিত্তিতে সারাদেশে শক্তিশালী কৃষক ক্ষেতমজুর সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়া হয়-

১. কৃষকদের ফসলের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। সিন্ডিকেট মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাবমুক্ত কৃষকদের অংশগ্রহণে রাষ্ট্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

২. সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতিসহ সকল কৃষি উপকরণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে বিএডিসিকে কার্যকর করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সার কারখানাগুলোকে চালু করতে হবে ও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সারের ভেজাল, কালোবাজারী রোধ করতে হবে।

৩. কৃষিপ্রধান এলাকাগুলোতে কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে। বন্ধ চিনিকল, পাটকল রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করতে হবে। একইভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কৃষি উপকরণ বিশেষত সার কারখানা, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা স্থাপন ও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. ভূমি সংস্কার করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। বিত্তশালীদের কাছ থেকে খাসজমি উদ্ধার করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অকৃষি খাস জমি ভূমিহীনদের পুনর্বাসনে ব্যবহার করার আইনগত বাধা দূর কর। সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পে দুর্নীতি, হয়রানি, দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে।

৫. কৃষি ঋণ মওকুফ ও সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। এনজিও, মহাজনী ঋণের তীব্র শোষণ ও কিস্তির হয়রানি বন্ধ করতে হবে। সরকারি ব্যাংক থেকে ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন চাষীদের ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু করতে হবে। কৃষক-ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র চাষীদের আর্মি-পুলিশের রেটে রেশন দিতে হবে।

৭. সকল বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও প্রতিবন্ধীদের মাসিক ভাতা ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

৮. ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে এমবিবিএস ডাক্তার ও প্রশিক্ষিত নার্স নিয়োগসহ পর্যাপ্ত ঔষধের ব্যবস্থা করতে হবে ও হেলথ কার্ড চালু করতে হবে।

৯. নদী ভাঙ্গন ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। ইকোনমিক জোন, পাওয়ার প্লান্ট ও ইটভাটা নির্মাণের নামে কৃষি জমি, বন ধ্বংস ও ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করা চলবে না।

১০. হাটে হাটে ইজারাদারি, জুলুম, নির্যাতন, হয়রানি বন্ধ করতে হবে। ঢলতা প্রথার নামে অতিরিক্ত ফসল আদায় বন্ধ করতে হবে। গেটের মুখে সরকারী টোল চার্ট টানাতে হবে।

১১. উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিজমির লবনাক্ততা দূর করতে সেচসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থ উপকূলীয় কৃষি ও কৃষকদের রক্ষায় ব্যয় করতে হবে।

১২. কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিএডিসিসহ ১৮টি সংস্থার কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটিয়ে প্রত্যেকটি সংস্থাকে প্রকৃতপক্ষে কৃষির উন্নয়নে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৩. প্রকৃত কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের তালিকা করে পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। তাদের বিনামূল্যে ব্যাংক একাউন্ট খুলে ভর্তুকি, প্রণোদনার টাকা সরাসরি একাউন্টে প্রদান করতে হবে।

১৪. মাছ, মুরগী, গবাদিপশু খাদ্যের দাম কমাতে হবে।

১৫. কৃষি শ্রমিকদের কাজের ধরন, এলাকা, বয়স বিবেচনায় মজুরি সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য দূর করতে হবে।

১৬. কর্ম পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিতে হবে।

১৭. কৃষি শ্রমিকদের সকল পরিবহনে অর্ধেক ভাড়া নিশ্চিত করতে হবে।

১৮. কৃষি শ্রমিকদের সুস্থ বিনোদনের জন্য প্রতিটি গ্রামে লাইব্রেরিসহ বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

সাম্যবাদ
১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০২৫

২য় পৃষ্ঠার পর

ঐকমত্য কমিশন

থেকে শুরু করে যে কয়টি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, প্রতিটি রাষ্ট্রই সমগ্র জনগণের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলির নিশ্চয়তা বিধান করেছিল, যা আজ পর্যন্ত কোনও পুঁজিবাদী দেশ করেনি। আমরা উল্লেখ করতে চাই যে– আইনস্টাইন, রমারঁল্যা, বার্ট্রান্ড রাসেল, মওলানা ভাসানী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দিনসহ অনেকেই সোভিয়েত ও চীনের সমাজতন্ত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের একটা প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল সমাজতন্ত্র। কমিশন বৈষম্যহীন রাষ্ট্রের কথা বলছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রথম মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হয়ে বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঘ) আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, কমিশন মুক্তবাজার অর্থনীতিকে সুপারিশ করছে। একথা এখন সর্বজনবিদিত যে, মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন– এগুলোর নামে বাইরের বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এবং দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় শ্রমজীবী মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ করে নিঃস্ব করে দেয়। একথা ভুলে যাওয়া যাবে না যে, পতিত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা গত ১৫ বছর ধরে দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য এই মুক্তবাজার অর্থনীতিকেই কার্যকর করেছিলেন।

বিচারব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রসঙ্গে

১. আমাদের মনে হয়েছে যে শুধু স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচারব্যবস্থা গড়ে তুললেই ন্যায়বিচার মিলবে না। যতক্ষণ না প্রশাসন, আইনসভা ও বিচারবিভাগ পারস্পরিক হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে, ততক্ষণ বিচারবিভাগ তার সামাজিক স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না এবং ন্যায়বিচারও মিলবে না। বিচার করলেও শাস্তি কার্যকর হবে না। বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর হবে না। অর্থাৎ এজন্য বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মতেস্কুর 'স্পিরিট অব দি ল' বইতে উল্লেখিত 'ড্রকটিন অব সেপারেশন অব পাওয়ার' তত্ত্বটিকে কার্যকর করতে হবে।

২. এথিক্স ও জুরিস্প্রুডেন্সের ছাত্ররা একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যা কিছু আইনসঙ্গত– তা ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত এবং নৈতিক নাও হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, যা কিছু প্রচলিত আইনসঙ্গত নয়– তাও অনৈতিক, অন্যায় ও অযৌক্তিক নাও হতে পারে। আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই বক্তব্যের একটি জ্বলন্ত প্রতিফলন। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা কমিশনের প্রতিবেদনে থাকা উচিত।

৩. প্রস্তাবনার একটা পয়েন্ট গণতান্ত্রিক চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক, এমনকি গণঅভ্যুত্থানে আইনজীবীদের সেমসময় আদালত প্রাঙ্গনে মিছিল, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ– যা দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করেছিলো, তাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। পয়েন্টটি হলো সারসংক্ষেপ অংশের ২৭ নম্বর প্রস্তাবনা। বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ শীর্ষক হেডিংয়ে বলা হয়েছে, "বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণেরহ উদ্দেশ্যে আদালত প্রাঙ্গনে আইনজীবী বা অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল কর্তৃক সব ধরনের সভা-সমাবেশ বা মিছিল নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং বিচারাঙ্গনে আইনজীবীদের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা নিরুৎসাহিতকরণ। বার সমিতিতে রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিলোপ করা।"

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রসঙ্গে

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার নির্দেশে পুলিশ-বিজিবি ও র‍্যাব ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে প্রায় দেড় হাজারেরও বেশি মানুষ শহিদ হন। ২৫ হাজারের বেশি আহত হন। পুলিশ ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর গণআন্দোলনের উপর নৃশংস দমনপীড়ণ বাংলাদেশের জন্মের পর থেকেই দেখা গেছে। কমিশন এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেনি। প্রশ্ন হলো, যে বাহিনী দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, ন্যায় ও সত্যকে তুলে ধরবে এবং অন্যায় প্রতিরোধ করবে– তাদের এই অধঃপতন হলো কেন? এর কারণ কি শুধু পতিত স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার? আমাদের দল নির্দিষ্টভাবে মনে করে, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো যত বৃদ্ধি পাবে, সরকার সেগুলোকে সমাধান করার সক্রিয় চেষ্টা যতদিন না করবে, বারবার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। একের পর এক ক্ষমতাসীন সরকার পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে সেই বিক্ষোভ দমন করবে। এভাবে ব্যবহৃত হতে হতে পুলিশ বাহিনীর চূড়ান্ত অধঃপতন ঘটে, যা আমরা জুলাই অভ্যুত্থানে দেখেছি। মনে রাখা দরকার যে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান থেকে জন্ম নেয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ছয় মাসের শাসনের মধ্যেই বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের উপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে, গুলি করে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের হত্যাও করেছে। আমাদের সুস্পষ্ট দাবি হলো, ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ বন্ধের সুপারিশ কমিশনের প্রস্তাবে থাকা উচিত। আমাদের এই দাবির দৃষ্টান্ত আছে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের সাথে বামপন্থীদের গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার এই নীতিটি কার্যকর করেছিল।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

এই প্রতিবেদনে অবৈধভাবে ক্ষমতা ধরে রাখার পরিকল্পনা, বিগত তিনটি জাতীয় নির্বাচন, জনগণের ম্যান্ডেটহীন ক্ষমতার ভয়াবহতা ও সীমাহীন দলীয়করণ নিয়ে আলোচনা আছে। এ ছাড়াও সংস্কারের অপরিহার্যতা ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ করার পরিকল্পনা প্রতিবেদনের ভূমিকায় আছে। আমরা নির্দিষ্টভাবে বলতে চাই যে, শুধুমাত্র গত তিনটি নির্বাচন নয়, বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই, অর্থাৎ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রথম নির্বাচন থেকেই প্রতিটি সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তদারকি সরকারের অধীনে যে চারটি নির্বাচন হয়েছে, সেগুলোই আপক্ষিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। প্রতিবেদনে এ কথার স্বীকৃতি আছে। কিন্তু এত পরিশ্রম করে নির্বাচনী সংস্কার সংক্রান্ত এই প্রতিবেদন অনুসন্ধান করতে পারেনি যে কেন এরকম হলো। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই উপমহাদেশের প্রায় সবকটি দেশেই নির্বাচনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ভোটারদের হুমকি ও জোর-জুলুম, বিপুল পরিমাণে কালো টাকার ব্যবহার– এ সবই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন পার্লামেন্টারি দলগুলির নৈতিক ইচ্ছার কাছে বারবার আবেদন করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। বাস্তবে বিদ্যমান ব্যবস্থায় জোর করে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক। সমগ্র বিষয়টির কার্যকারণ অনুসন্ধান না করে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ করার সদিচ্ছা কমিশনের থাকতেই পারে, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। ব্যবস্থাটাকে আড়াল করে সত্যের খোঁজ পাওয়া যাবে না। ফলে আমাদের দল মনে করে এই সমগ্র বিষয়টি সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মিলে গভীরভাবে পর্যালোচনা করুক।

প্রতিবেদন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত শিথীল করা হয়েছে। আমাদের দলের সুনির্দিষ্ট মত হলো বহুদলীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে শুধুমাত্র বড় দলগুলো নয়, ছোট রাজনৈতিক দল ও নতুন রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেয়া উচিত। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক শর্ত করা উচিত নয়।

এখানে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সংস্কার করা ও নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করা।

জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কমিশনের উপর আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলাম। প্রয়োজনে পরে অন্যান্য বিষয়গুলোর উপর এবং এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আমাদের বিস্তারিত বক্তব্য আমরা রাখব। আমাদের দল মনে করে যে, প্রতিটি সংস্কার প্রস্তাবনাই আলোচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সংস্কার প্রতিবেদনগুলোর মধ্য দিয়ে যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হচ্ছে, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সমাজের রূপরেখা। শত শহিদের রক্তস্নাত জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা খোলা মনে, সহসশীলতার পরিচয় দিয়ে, পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে দেশের ব্যাপারে একটি সঠিক-সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ডাক দিচ্ছে।

নারীমুক্তি কেন্দ্রের সদস্য সংগ্রহ ও উঠান বৈঠক

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের ধারাবাহিক সদস্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে গত ২৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার পুরানাপৈল ইউনিয়নের মাস্টারপাড়া গ্রাম, পাঁচবিবি থানার ধরঞ্জী ইউনিয়নের চকশিমুলিয়া গ্রাম ও পাঁচবিবি থানার আয়মা রসুলপুর ইউনিয়নের কোড়িয়া মণ্ডলপাড়া গ্রামে সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক তৌফিকা লিজার উপস্থিতিতে সদস্যদের নিয়ে পরবর্তীতে গ্রামে-গ্রামে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সকল পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা ও কুসংস্কারমুক্ত আধুনিক চিন্তা ও জীবনযাত্রার বিকাশ, নারীশিক্ষা সম্প্রসারণ এবং নারী নির্যাতন-মাদক-জুয়া বন্ধে করণীয় প্রসঙ্গে আলোচনা হয়।

শিশু-কিশোর মেলার উদ্যোগে ভাষা শহীদ দিবস পালন

মহান ভাষা দিবস স্মরণে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল বেলা রাজধানীর সেগুনবাগীচা এলাকায় শিশু-কিশোর মেলার উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এলাকার বিভিন্ন বয়সের শিশুরা এতে অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিশু-কিশোর মেলার সম্পাদক দীপা মজুমদার।

এলাকার অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে এই আয়োজনে যোগ দেন। নৈতিক অবক্ষয়ের এই সময়ে শিশু কিশোরদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও উন্নত চরিত্র বিকাশের জন্য এই ধরণের আয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকরা প্রত্যেকেই আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

সাম্যবাদ
'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০২৫

কোল্ডস্টোরেজের ভাড়া বৃদ্ধি ও ন্যায্য দাম না পেয়ে নিঃস্ব আলুচাষী

রংপুরে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ করেছেন আলুচাষীরা

আলু আমাদের প্রধান সবজি এবং অর্থকরী ফসল। বিশ্বব্যাপী আলুর চাহিদা ব্যাপক। উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে রংপুরের জমি এবং আবহাওয়া আলু চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ফলে এই অঞ্চলের কৃষকরা প্রচুর আলু উৎপাদন করে। কিন্তু আলুর বাম্পার ফলন হলেও কৃষক লাভের মুখ দেখতে পারে না। আলু যেহেতু পঁচনশীল সবজি, তাই কৃষক বেশিদিন আলু ঘরে রাখতে পারে না। দ্রুত তাকে আলু বিক্রি করতে হয়। এই সময়ে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট আলুর বাজারে ধ্বস নামিয়ে দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কৃষক কোল্ডস্টোরে আলু রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আলুর সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন কোম্পানি স্টোর মালিকদের সাথে যোগসাজশ করে স্টোরের বেশিরভাগ জায়গা আগেই বুকিং করে রাখে। ফলে কৃষকরা কোল্ডস্টোরেও জায়গা পায় না। এভাবে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের সাথে কোল্ডস্টোর মালিকদের সিন্ডিকেট যুক্ত হয়ে কৃষককে পানির দরে আলু বিক্রি করতে বাধ্য করে। এবারেও দাম কম থাকার কারণে কৃষক জমিতে আলু বেশিদিন রেখে পাকিয়ে বীজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্টোরের বেশিরভাগ জায়গা খাবার আলুর জন্য বুকিং থাকায় বীজ আলুও কৃষকরা রাখতে পারবে না। ফলে আগামী বছর বীজের ভীষণ সংকট তৈরি হবে।

প্রশাসনের তদারকির অভাবে কোল্ডস্টোর মালিকরা রাতারাতি আলুর ভাড়া দ্বিগুণ করে দিয়েছে। গতবছর এক বস্তা আলুর স্টোর ভাড়া ছিলো ২৮০ টাকা, এবারে একই পরিমাণ আলু রাখার জন্য ব্যয় করতে হবে ৫৬০ টাকা।

এর প্রতিবাদে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বুধবার সকাল ১১টায় রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে আলু চাষীরা একত্র হয়েছিলেন। রাস্তায় আলু ফেলে দিয়ে 'আলুচাষী সংগ্রাম কমিটি, রংপুর'-এর উদ্যোগে এই বিক্ষোভ পালন করেন তারা। সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আহসানুল আরেফিন তিতু, আলুচাষী জমশেদ আলী, রেজওয়ান শাহ, তছলিম উদ্দিন, রানা মিয়া, লক্ষীকান্ত রায়, মইনুল ইসলাম, নাসিরউদ্দিন প্রমূখ।

আলুচাষীদের দাবিসমূহ:

১. প্রতি কেজি আলুর ভাড়া ৮ টাকা বাতিল করে ১ টাকা ৫০ পয়সা নির্ধারণ কর।
২. অগ্রিম বুকিংয়ের নামে বস্তা প্রতি ১০০ টাকা আদায় বন্ধ কর।
৩. অবিলম্বে সরকারি উদ্যোগে প্রতিটি উপজেলায় বিশেষায়িত বীজ হিমাগার নির্মাণ কর।
৪. সকল হিমাগারে প্রকৃত কৃষকের জন্য ৬০ ভাগ জায়গা বরাদ্দ বাধ্যতামূলক কর।
৫. লাভজনক দামে আলু বিক্রি করতে না পারার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
৬. চাষীদের আলু সরকারি উদ্যোগে বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করতে হবে।

চাকরি স্থায়ীকরণসহ ছয় দফা দাবিতে

গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারীদের লড়াই চলছে

গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় পিয়ন কাম গার্ড পোস্টে প্রায় ২ হাজার ৫০০ কর্মচারী কাজ করেন। এদের সাথে গ্রামীণ ব্যাংকের আচরণ যেমন অমানবিক, তেমনি বেআইনি ও শ্রমশোষণমূলক। তারা এই কর্মচারীদের দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে (নো ওয়ার্ক, নো পে) কাজ করান। এদের অনেকে ২০/৩০ বছর ধরে চাকরি করছেন, কিন্তু তাদের চাকরি স্থায়ী করা হচ্ছে না। কোনরকম কারণ দর্শানো ছাড়াই মৌখিকভাবে তাদের ছাঁটাই করে দেয়া হয়। তাদের কোন নিয়োগপত্র নেই, নির্ধারিত মাসিক বেতন নেই, ইনক্রিমেন্ট-ওভারটাইম-গ্র্যাচুইটি-প্রভিডেন্ট ফান্ড-পেনশনসহ শ্রম আইনে বর্ণিত কোন অধিকারই তাদের নেই। গ্রামীণ ব্যাংক যেন এই দেশের আইনের বাইরের কোন সংস্থা!

গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদত্যাগ প্রসঙ্গে যে নির্দেশিকা আছে তার ১৬.৬.৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত পিয়ন কাম গার্ডদের কোন অবস্থাতেই নয় মাসের বেশি দৈনিক ভিত্তিতে কাজে রাখা যাবে না। অথচ গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের রচিত গাইডলাইনও মানছেন না।

নয় মাসের পর থেকে চাকরি স্থায়ীকরণ, শ্রম আইন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করাসহ ছয় দফা দাবিতে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারীরা ২০১২ সাল থেকে লড়াই করছেন। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে তারা তাদের দাবি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করার পর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৪০ জন কর্মচারীকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়। এরই মধ্যে তারা কয়েক দফা শ্রম উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। সর্বশেষ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ থেকে তারা ঢাকায় প্রেসক্লাব ও পরবর্তীতে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করেন ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গত ৫ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আন্দোলনরত কর্মচারীদের ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিনিধিদের তলব করে আলাদা আলাদাভাবে দু'পক্ষের বক্তব্য শোনেন। এই ব্যাপারে অধিদপ্তর সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেবেন বলে আন্দোলনকারী শ্রমিকরা প্রত্যাশা করছেন। পূর্ণ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের লড়াই চলবে।

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির উদ্বেগ প্রকাশ

খুন-ধর্ষণ-ডাকাতি-বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, যৌন হয়রানি, প্রকাশ্য খুনের হুমকি এবং সৃজনশীল তৎপরতা বন্ধ করতে সংঘবদ্ধ সহিংসতার বিরুদ্ধে সরকারের দায়িত্বশীল সক্রিয় ভূমিকার আহ্বান জানিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি।

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, সারাদেশে খুন, ধর্ষণ, মব সহিংসতা, হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক তৎপরতা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, নারীর চলাফেরা, খেলা ইত্যাদির ওপর আক্রমণ আসছে। এমনকি প্রকাশ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন লেখক শিক্ষককে হত্যার হুমকি দিয়ে তা ব্যাপক প্রচার করার পরও হুমকিদাতার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এদিকে আবরার হত্যায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীসহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধীর জেল থেকে পালানোর খবর পাওয়া যাচ্ছে। কক্সবাজারে সমিতি পাড়ায় নিরস্ত্র জনগণের উপর বিমান বাহিনীর গুলিবর্ষণের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন স্থানীয় যুবক শিহাব কবির নাহিদ। গায়ের জোরে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার স্থানীয় জনগণকে উচ্ছেদের পাঁয়তারার মধ্যে এই ঘটনা স্বাধীন তদন্তের দাবি করে। পোস্ট মর্টেম নিয়ে ইতিমধ্যে রহস্যজনক আচরণ করা হচ্ছে। আমরা এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার জবাবদিহি এবং স্বাধীন তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দাবি করি। সংবাদ মাধ্যমকে এসব ঘটনা যথাযথভাবে মানুষকে জানানোতে সক্রিয় হবার দাবি জানাই।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি নিয়েও চিন্তিত। সেখানেও নারীর প্রতি বৈরী আচরণ ও সহিংসতা থেমে নেই। সর্বশেষ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দলবদ্ধ সহিংসতার প্রতিবাদ করায় ৯ নারী শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও তাদের প্রতি প্রক্টরের ঘৃণ্য আচরণ কার্যত যৌন নিপীড়নের পক্ষে প্রশাসনের অবস্থান নির্দেশ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনের নাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সক্রিয় নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর নামে রাখাতে আমরা খুবই বিস্মিত। আমরা অবিলম্বে প্রক্টর পরিবর্তন এবং নামকরণ ও ছাত্রী বহিষ্কারের এসব অন্যায় সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানাই। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবিদের নাম বিভিন্ন ভবন থেকে বাদ দেয়ার ঘটনাও আমাদের ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। কাদেরকে সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব দিয়েছে তা চিন্তা করে আমরা উদ্বিগ্ন। অবিলম্বে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সত্যেন বসু, জগদীশ চন্দ্র বসু, জীবনানন্দ দাশ, লালন সাঁই, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, জিসিদেব, ডা. আলীম চৌধুরী, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রতি যথাযথ সম্মান জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানাই। আর সরকারের উচিত হবে এই মহান ব্যক্তিদের নামে বড় বড় স্থাপনার নামকরণ করা।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর যেখানে জনগণের রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক, নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত হওয়ার কথা- সেখানে প্রতিনিয়ত জানমালের নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়ছে। জনগণের নিরাপত্তা বিধানের কথা বলে সেনাবাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা, কিংবা যৌথ বাহিনীর একের পর এক অভিযান জনগণের নিরাপত্তার বদলে হয়রানি ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বৃদ্ধি করেছে। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী অভ্যুত্থানের প্রথম ছয় মাসে বিশ জনের অধিক ব্যক্তি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, যার অধিকাংশ সেনা হেফাজতে, নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন শুধুমাত্র মামলার হিসাবে ডাকাতি ও দস্যুতার সংখ্যা বেড়েছে ৫০ শতাংশ। যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে শুধু তাই নয়, নারীর প্রতি সামাজিক, সাংস্কৃতিক আক্রমণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সাথে অমানবিক আচরণের ঘটনা বাড়ছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বিগত কয়েকমাসের কর্মকাণ্ডে এটা স্পষ্ট বর্তমান সরকার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মর্মবস্তু ধারণ করতে ক্রমাগত ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। আমরা অস্বীকারের সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব স্বীকার করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে সরকারের দায়িত্বশীল ও সক্রিয় ভূমিকা দাবি করছি। ন্যায্য দাবি নিয়ে প্রতিবাদকারীদের প্রতি সহনশীলতা এবং সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসে নিয়োজিত অপরাধীদের দমনে দৃঢ়তা দাবি করছি।

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষে মো: শফি উদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org